তোরের কাগজ

তারিখ ... JUL. 1 8 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

৩৭

মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণ : ধ্বনিতত্ত্ব

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ধ্বনি, ধ্বনির উচ্চারণ, ধ্বনির পরিবর্তন বানানের নিয়মের ক্ষেত্রে ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান এবং সন্ধি ও তার প্রকারভেদ।

ধ্বনিতত্ত্ব :

শব্দকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে ধ্বনি পাওয়া যায়। আর ধ্বনিকে যে চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় সেগুলো হলো বর্ণ। বাংলা বর্ণমালায় মোট ৫০টি সরল বা অসংযুক্ত বর্ণ রয়েছে। এর মধ্যে ১১টি স্বরবর্ণ এবং ৩৯টি ব্যঞ্জনবর্ণ। স্বরবর্ণের মধ্যে 'ঐ' আর 'ঔ' হচ্ছে 'যুগ্ম স্বরধ্বনির' প্রতীক। এর সরল নয়, এর অনেকগুলো নাম 'দ্বিস্বর' 'যৌগিক স্বর' সন্ধিস্বর বা সান্ধ্যক্ষর। আর মৌলিক স্বরধ্বনি হচ্ছে সাতটি যেমন— অ, অ্যা, আ, ই/ঈ, উ/ঊ, এ, ও। স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে 'কার' আর ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে 'ফলা'। মোট ৫০টি বর্ণের মধ্যে ৩২টি বর্ণে পূর্ণমাত্রা বসে, আটটি বর্ণে অর্ধমাত্রা ও ১০টি বর্ণে কোনো মাত্রা বসে না।

ধ্বনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখবিবরে উচ্চারণের মূল উপকরণ 'জিহ্বা' ও ওষ্ঠ উচ্চারণ স্থানের নামানুসারে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়। যথা- ১. কণ্ঠ বা জিহ্বামূলীয় ২. তালব্য বা অগ্রতালুজাত ৩. মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় ৪. দন্ত্য বা অগ্রদন্তমূলীয় এবং ৫. ওষ্ঠ বর্ণ। আবার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রথম ২৫টি ব্যঞ্জনধ্বনি (স্পর্শ ব্যঞ্জন)কে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১. অঘোষ ২. ঘোষ; একইভাবে উচ্চারণের সময় বাতাসে চাপের স্বল্পতা ও আধিক্যের ওপর নির্ভর করে স্পর্শ ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত পাঁচটি বর্গে বিন্যস্ত ২৫টি বর্ণের পর 'য, র, ল, ব' কে বলে অন্তঃস্থ বর্ণ; 'শ, ষ, স, হ'কে বলে উষ্ম বর্ণ, 'ড়/ঢ়'কে তাড়নজাত বর্ণ বলে। র = কম্পনজাত এবং ল= পার্শ্বিক বর্ণ। ং, ঃ, ঁ- এগুলোকে পরাশ্রয়ী বর্ণ বলে। অন্তঃস্থ 'য' ও অন্তঃস্থ 'ব' দুটো বর্ণ হচ্ছে অর্ধস্বর (Semi Vowel). অন্তঃস্থ 'য'-এর উচ্চারণ ইংরেজি Y-এর মতো অন্তঃস্থ 'ব'-এর উচ্চারণ ইংরেজি 'W' ও আরবি 'ওয়া' এর মতো। এটি কেবল ফলায় পাওয়া যায়। আর আরবি / ফারসি শব্দের উচ্চারণ ঠিকমতো না করলে শব্দের অর্থ বদলে যায়।

ধ্বনি পরিবর্তন :

উচ্চারণের দ্রুততার জন্য এবং উচ্চারণের অসাবধানতার জন্য অনেক সময় শব্দের অল্প বিস্তর পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তন অনেকটা আঞ্চলিকতার কারণেও ঘটে। যেমন : শব্দের প্রথমে স্বরধ্বনি এলে তাকে 'আদি স্বরাগম' বলে, যেমন : স্ত্রী > ইস্ত্রী, স্কুল > ইস্কুল; শব্দের মধ্যে স্বরের আগমন ঘটলে তাকে 'মধ্য স্বরাগম' বলে, যেমন : স্নেহ > সিনেহ, রত্ন > রতন, ফিল্ম > ফিলিম। এর অন্য নাম বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি। আবার দিশ > দিশা, বেঞ্চ > বেঞ্চি ইত্যাদিতে শেষে স্বরের আগমন ঘটে বলে তাকে অন্ত্য স্বরাগম বলে, শব্দের শেষের ই-কার বা উ-কার যদি শব্দের মাঝে চলে আসে তবে তাকে 'অপিনিহিতি বলে, যেমন : আজি > আইজ, রাখিয়া > রাইখ্যা, সত্যি > সইত্য, চারি > চাইর। উদাহরণ দেখে এগুলো ভালো মনে রাখা যায়। যেমন : 'দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি' হচ্ছে স্বরসঙ্গতি; 'গিলা > গেলা, মিঠা > মিঠে' হচ্ছে চলিত বাংলায় স্বরসঙ্গতি; 'ধপ + ধপ > ধপাধপ, টপ + টপ > টপাটপ' হচ্ছে অসমীকরণ; 'বসতি > বস্তি, জানালা > জান্‌লা' হচ্ছে সমপ্রকর্ষ বা স্বরলোপ; বাকস > বাস্ক, রিক্সা > রিস্কা হচ্ছে ধ্বনি বিপর্যয়; 'জন্ম > জন্ম, কাঁদনা > কান্না' হচ্ছে সমীভবন; 'শরীর > শরীল, লাল > নাল' হচ্ছে বিষমীভবন; 'পাকা > পাক্কা; সকাল > সক্কাল' হচ্ছে দীর্ঘব্যঞ্জন; 'কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা' হচ্ছে ব্যঞ্জন বিকৃতি; 'বউদিদি > বউদি, বড়দাদা > বড়দা > বদ্দা', হচ্ছে ব্যঞ্জনচ্যুতি; 'ফাল্গুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার' হচ্ছে অন্তর্হতি; 'শুনিয়া > শুনে, বলিয়া > বলে' হচ্ছে অভিশ্রুতি। ধ্বনি পরিবর্তনের প্রায়গুলোই বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা থেকে এসেছে।

❑ মোঃ মনিরুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক,
বাংলাদেশ রাইফেলস স্কুল ও কলেজ।